লুলু

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

১

ওকে দেখলেই কেমন যেন গা শিরশিরিয়ে ওঠে অমিত ভাদুড়ির। অদ্ভুত লাগে! বিশেষ করে ওর চোখদুটো। মনে হয়, দুনিয়ার সমস্ত উদাসীনতা নৈর্ব্যক্তিকতা, আর কিছু যন্ত্রণার কাহিনী ঐ দুটো হালকা বাদামি চোখে ছায়া ফেলে ক্রমাগত সরে যায়। চোখদুটো যদি হিংস্রতায় ভরা হতো তবে হয়তো একটু শান্তি পেতেন তিনি। বুঝতে পারতেন, যে ও স্বাভাবিক! রাগ, দুঃখ, জিঘাংসা ইত্যাদি অনুভূতিগুলো ওর মধ্যে আছে! যে ষড়রিপুর টানে প্রতিটা মানুষ রোজই পুতুলনাচ নাচছে, ও যে সেই পুতুলনাচের বাইরে নয়, কোনওরকম ব্যতিক্রম নয়, একদম স্বাভাবিক এক সত্তা— অন্তত এইটুকু তো বোঝা যেত!

অথচ গত কয়েকদিন ধরে ওর হাবভাবের মধ্যে একটুও স্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি কেউ। মিডিয়া বলছে, ও ন্যায়বিচার চায়! কিন্তু এটা কী জাতীয় ন্যায়প্রার্থনা!

অমিত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল পুলিসে চাকরি করছেন। অথচ এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনও হননি! ও যদি ইট ছুঁড়ে অফিসার ভাদুড়ির বাড়ির জানলা ভাঙত, কিংবা তাঁর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে স্লোগানও দিত—তবু ওকে বোঝা অনেক সহজ ছিল। কিন্তু যে এসবের কিছুই করে না, স্রেফ সকাল থেকে রাত অবধি তাঁর বাড়ির লনের এককোণে চুপ করে বসে থাকে, আর প্রত্যহ একটা করে আটার রুটি উপহার দেয়, তাকে নিয়ে কী করবেন তিনি!

হ্যাঁ, একটা আটার রুটি! এটাই ঘটনা! গত পনেরোদিন ধরে অফিসার ভাদুড়ির বাড়িতে এই অদ্ভুত ঘটনাটাই ঘটছে! প্রথমদিন তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারেননি অমিত। রোজকার মতোই প্রাতঃকালীন জগিং সেরে এসে যখন দরজার বাইরে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা নিচু হয়ে তুলে নিতে গেলেন, তখনই চোখে পড়ল, ঠিক দরজার সামনে, পাপোশের ওপরে একখানা আস্ত, নিটোল আটার রুটি পড়ে আছে! কিছুক্ষণের জন্য অবাক হয়ে যান তিনি। একটা আস্ত আটার রুটি এখানে কী করছে! কী করেই বা এল! তিনি বা তাঁর একমাত্র ছেলে ঋক কখনই রুটি খান না। এ বাড়িতে রুটির পাটই নেই।

তবে এত সকালে এরকম একটা আটার রুটি দোরগোড়ায় পড়ে আছে কেন? অমিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কোনও গোলমাল নেই তো? দীর্ঘদিন পুলিশে চাকরি করে অগুনতি শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন। তাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে গিয়েছে নাকি? কে বলতে পারে, হয়তো রুটিটা বিষাক্ত! অথবা কোনও বোমা-টোমা ফিট করা আছে ওটার গায়ে...!

ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল তাঁর! নাঃ, পুলিশে চাকরি করে মাথাটাই গিয়েছে! স্পষ্ট দেখছেন একখানা নিরীহ রুটি পড়ে আছে, আর তিনি কিনা মুহূর্তের মধ্যেই বিষ, বোমা—কত কিছু ভেবে ফেললেন! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসে ফেলে আলগোছে রুটিটাকে তুলে নিলেন অমিত। সম্ভবত বাসি রুটি। রীতিমতো মোটা দানার সবচেয়ে ওঁচা আটা দিয়ে তৈরি। এরকম একটা বাসি রুটি তাঁর দরজার সামনে এল কী করে?

প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়েই পেছনের দিকে তাকালেন অফিসার ভাদুড়ি। তখনই চোখে পড়ল ওকে! কী অদ্ভুত দেখতে!

আপাদমস্তক কালো মিশমিশে দেহ, চোঁয়াড়ে মুখ, অতি দীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, হাড়-পাঁজরগুলোও গোনা যায়, পিঁচুটি কাটা চোখদুটোয় বিশ্বের সমস্ত ঔদাসীন্য নিয়ে সামনের লনের এককোণে বসে আছে। অমিত ভাদুড়ির চোখে চোখ পড়তেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিটা কেমন যেন! অন্তত অমিতের মনে হল, কোনও স্বাভাবিক দৃষ্টি এমন হয় না! হয় এ কোনও উন্মাদের চোখ, নয়তো অন্তর্যামীর!

অমিত রুটিটা নিয়ে এগিয়ে এলেন তার দিকে। হেসে সস্নেহে বললেন, 'এটা বুঝি তোর? দরজার বাইরে রেখেছিস কেন? নে, খা'।

কথাটা বলেই তিনি তার পাশে সযত্নে রেখে দিলেন বাসি রুটিটা। সে একবার তাচ্ছিল্যভরে খাদ্যবস্তুটার দিকে তাকাল। কিন্তু তার হাবেভাবে মনে হল বুঝি সে আদৌ জানে না যে ওটা খাওয়া যায়! পরম অনাগ্রহে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অমিতের কথার জবাবে একটিও শব্দ খরচ করল না সে। যেন কোনওরকম জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই নেই! তিনি ওর দিকে একবার তাকিয়ে আপনমনেই হেসে চলে গিয়েছিলেন বাড়ির ভেতরে।

কিন্তু ঘটনাটা ওখানেই শেষ হয়নি।

কিছুক্ষণ পরে স্নান, ব্রেকফাস্ট সেরে, ইউনিফর্ম পরে ,থানায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তখনই আবার চমক! এ কী! রুটিটা যে ফের ওই পাপোশের ওপরেই পড়ে আছে! আবার কী করে এল! ওটা তো ওকে নিজের হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অমিত! খায়নি! যাব্বাবা! আবার এখানে রেখে গেল কেন! এ তো মহা মুশকিল!

তিনি এবার বিরক্ত হয়ে সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে মায়াকে ডেকে ওকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখো, ওই ব্যাটা এখানে রুটিটা রেখে গেছে। হয় ওকে দিয়ে এসো, নয় কোথাও ফেলে দাও। আমার বাড়িটা ভাগাড় নয় যে দরজার সামনে এঁটো বাসি রুটি পড়ে থাকবে'।

মায়া ঘাড় নেড়ে কর্তব্যপালন করতে চলে গেল। তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তখন তাঁর মরারও সময় নেই। একবার থানায় ঢুকলে তো আর দম নেওয়ার ফুরসতও থাকে না। পেন্ডিং কেসগুলোর তদন্ত করা, ওপরওয়ালাদের সঙ্গে জরুরি মিটিং, গুরুত্বপূর্ণ কেসের আপডেট দেওয়া, সারাদিন ধরে লোক্যাল গ্যাংস্টারদের পেছনে ছোটা, চোর-ডাকাত- খুনি-হিস্ট্রি শিটার ঠেঙানো—কত কাজ! সেসব মিটিয়ে হতক্লান্ত দেহে যখন রাতে বাড়ি ফিরলেন, তখন বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও থমকে গেলেন অমিত! যে দৃশ্যটা দেখলেন, তাতে তাঁর হাড় জ্বলে গেল! রুটিটা এখনও ঠিক সেখানেই পড়ে আছে! এক ইঞ্চিও নড়েনি!

'মায়া! মা—য়া!' প্রচণ্ড রাগে, বিরক্তিতে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর চিৎকার শুনে মায়া তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসে। সে সম্ভবত রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হাতে তখনও গুঁড়ো হলুদ, তেল লেগে আছে। সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, 'কী হয়েছে বাবু?'

'এই নোংরা রুটিটা এখনও এখানে পড়ে আছে কেন? তোমায় বলেছিলাম না এটার ব্যবস্থা করতে!' অমিত ধমকে ওঠেন—'একটা কাজও কি ঠিকমতো করতে পারো না তুমি?'

মায়া বিস্ময়বিহ্বল চোখে বাসি, শক্ত রুটিটার দিকে তাকিয়ে থাকে! তারপর আস্তে আস্তে বলে—'বাবু, আমি তো এটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলাম! আবার এখানে কী করে এল!'

অমিত বিস্ময়াভিভূত! পিছন ফিরে দেখলেন, পাগলটা এখনও ঠায় ওখানেই বসে আছে! রুটিটা যেমন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নড়েনি একচুলও, তার মালিকও ঠিক তেমনই অটল স্থৈর্যে চুপ করে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

'মরুক গে।' ভীষণ বিরক্তিতে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে রুটিটাকে বুটের তলায় পিষে ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। দুটো উজ্জ্বল চোখের সামনে অভদ্রের মত দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

অমিত বিরক্ত হলেও এ ঘটনা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। যে লোক সবসময়ই চোর-ডাকাত-খুনি-রেপিস্টদের পিছু ধাওয়া করছে, তার একটি নিরীহ রুটি নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? অমিতও ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু ও তাঁকে কিছুতেই ভুলতে দিল না! গত পনেরোদিন ধরে প্রতিমুহূর্তে ওর কথাই ভেবে চলেছেন তিনি। ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ গত পনেরোদিন ধরেই ঘটে চলেছে এই একই ঘটনা! রোজ! ভোর হওয়ার আগেই সে গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির হয়। অমিতের দরজার সামনে সযত্নে একটি বাসি আটার রুটি রেখে দেয়। তারপর টুঁ শব্দটিও না করে তাঁর লনের এক কোণে বসে থাকে! সবচেয়ে অদ্ভুত, ওর মুখে কোনও শব্দ নেই! বোবা? চেঁচিয়ে ভয় দেখালে, তেড়ে গেলে বা চলে যেতে বললেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই! শুধু চোখদুটো যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। মায়া যতবার রুটিটাকে তুলে ফেলে দেয়, ততবারই সে কুড়িয়ে নিয়ে এসে যথাস্থানে রাখে। এছাড়া আর কোনওরকম হেলদোল দেখা যায় না।

বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার কথা মিডিয়ার লোকেদের জানতে বাকি রইল না! একজন পুলিস অফিসারকে রোজ একজন একটা করে বাসি আটার রুটি উপহার দিয়ে যাচ্ছে—এ ঘটনা খুব সাধারণ নয়! রহস্যের গন্ধ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়া লাফিয়ে উঠল! এখন তো চ্যানেলে চ্যানেলে ওর ছবি, নিউজ পেপারে ওর ফটোসহ

হেডলাইন! সমস্ত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে শুধু ওরই নাম! এখন সে 'টক অফ দ্য টাউন'।

মিডিয়ার দৌলতে অবশ্য একটা উপকার হয়েছে। ওর নামটা জানতে পেরেছেন অমিত। হতভাগার নাম লুলু! পরিচয়ও জানতে বাকি নেই। কিন্তু এখনও জানতে পারেননি যে ও আদতে চায়টা কী! কীসের অপেক্ষায় রোজ একটি রুটি উপহার নিয়ে আসে? কীসের আশায় ঠায় বসে থাকে তার লনে! ওর আসল উদ্দেশ্যটা কী?

২

'স্যার... স্যার! একটা প্রশ্ন ছিল!'

'অফিসার ভাদুড়ি! একটা বাইট প্লিজ্'।

'আপনার কি মনে হয় না খুশি লস্করের মৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে?'

বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের ভিড়! লুলুর এই অর্থহীন কাণ্ড দেখার ও মানুষকে দেখানোর জন্য রোজই অফিসার অমিত ভাদুড়ির বাড়ির সামনে মিডিয়ার লোকেরা ভিড় জমাচ্ছে। অমিতকে দেখতে পেলেই হাতে 'বুম' নিয়ে পড়িমরি করে দৌড়চ্ছে তাঁর পেছনে। এমনকী অফিসেও ধাওয়া করতে ছাড়ছে না। অমিত অবশ্য এসবকে আদৌ পাত্তা দেন না। কিন্তু এবার ব্যাপারটা বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে নিজেকে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন তিনি! ব্যাপারটা এমন 'মিডিয়া হাইপ' পেয়েছে যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে!

'আপনার কী মনে হয় স্যার? লুলু রোজ একটা করে রুটি দিয়ে যাচ্ছে কেন আপনাকে? তবে কি ও বুঝতে পেরেছে যে পুলিসের কাছে ন্যায় চাইতে হলে বিনিময়ে কিছু দিতেও হয়?'

কোনও ফিচেল সাংবাদিকের বজ্জাতিমার্কা প্রশ্নে চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল অমিতের। তিনি প্রতিদিনের মতই নিস্পৃহ মুখে সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন। অর্থপূর্ণ প্রশ্নটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিরক্তিতিক্ত স্বরে সজোরে বলে উঠলেন—'মানে! কীসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছেন! কীসের ন্যায়? কীসের বিনিময়?'

যে রিপোর্টারটি প্রশ্ন করেছিল সে এবার আরও খোলসা করে বলল—'আমি ঘুষের কথা বলছি স্যার। লুলুও কি তবে বুঝেছে যে পুলিসকে ঘুষ দিতে হয়? ও তো টাকাপয়সা কিছু দিতে পারবে না। তাই যা পারে, তাই আনে। ইয়ে, মানে উপহার হিসেবে হয়তো! ওই যাকে হিন্দিতে বলে 'নজরানা' বা 'ভেট'।'

'ফাজলামি করার জায়গা পাননি! ঘুষ!' সৎ পুলিসকর্মী অমিত ভাদুড়ির ইচ্ছে করছিল এখনই ঠাস করে বদমায়েশ ছোঁড়াকে এক বিরাশি সিক্কার পুলিসি থাপ্পড় মারেন। তবু প্রচন্ড ইচ্ছেটাকে দমন করে বললেন, 'লুক্ অ্যাট হিম্! আপনার মনে হয় যে ও এসব আদৌ বোঝে! ওর সে আই কিউই নেই! যত্তসব পাগল, ছাগলের কাণ্ডকে আপনারা তোল্লাই দিয়ে চলেছেন। আপনাদের টি আর পি বাড়ানোর জন্য যদি এসব করতে হয়, তবে করুন। কিন্তু আমাদের সততার দিকে আঙুল তুলছেন কেন?'

এবার ভিড় থেকে একটি বলিষ্ঠ চেহারার মেয়ে এগিয়ে আসে —'লুলু কিন্তু পাগল বা ছাগল কোনটাই নয়। ও খুশি লস্কর নামের ছ' বছরের শিশুটির জন্য বিচার চাইছে, যা একমাসেও আপনারা দিতে পারেননি। খুশি লস্কর গ্যাংরেপ-মার্ডার কেস এখনও ক্লোজড্ হয়নি। পুলিস অপরাধীদের গ্রেফতার করা তো দূর, তদন্তকে এক ইঞ্চিও এগতে পারেনি! এটা কি পুলিস-প্রশাসনের ব্যর্থতা? নাকি এই অবহেলা ইচ্ছাকৃত?'

'আশ্চর্য!' গর্জন করে ওঠেন অমিত—'আপনি তো সরাসরি আমাদের ওপর করাপশনের চার্জ আনছেন! তাও আবার লুলুর আচরণের ভিত্তিতে! আপনাকে কে বলেছে যে ও খুশি লস্করের অপরাধীদের বিচার চায়? লুলু আপনাকে বলেছে? না, আপনি স্বয়ং অন্তর্যামী!'

মেয়েটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল—'কেন স্যার? আপনার কি নিজেরও মনে হয় না যে লুলু আসলে ধরনায় বসেছে! ও রোজ এসে আপনার দোরগোড়ায় একটা করে রুটি রাখে, এবং ঠায় আপনার বাড়ির সামনে বসে থাকে। এই অদ্ভুত আচরণের অন্য কোনও অর্থ কি ভেবে পেয়েছেন আপনি?'

'ধরনা!' প্রবল বিস্ময়ে অমিতের মুখ হাঁ হয়ে যায়। কী সব বলছে ওরা! লুলু তাঁর বাড়ির সামনে নাকি ধর্ণায় বসেছে! ও পলিটিক্যাল লিডার নাকি! 'ধরনা' শব্দের অর্থ জানা তো দূর, শব্দটাই কি জীবনে শুনেছে?

'জাস্ট রাবিশ'। তিনি বিরক্ত হয়ে নিজের গাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান।

'স্যার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে লুলুই কিন্তু খুশি লস্করের মার্ডার ও রেপকেসের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। দুষ্কৃতীরা যখন খুশিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের গাড়িটার পেছন পেছন দৌড়েছিল ও। হয়তো জানে যে আপনিই এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার...!'

'তাতে কী?' এবার আক্ষরিক অর্থে প্রায় তেড়েই যান তিনি, 'ওকে জেরা করতে হবে? কোর্টে তুলব প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসাবে? আপনারাই যখন সবকিছু জেনে বসে আছেন, তখন আপনারাই অপরাধীদের খুঁজে বের করুন না! লুলুকে জেরা করুন। কিন্তু দয়া করে পুলিসের দিকে আঙুল তুলবেন না'।

বলতে বলতেই তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান গাড়ির দিকে। পেছনের সিটে উঠে বসে কাচ তুলে দিলেন। আর কোনও কথা নয়। এমনিতেই সকাল থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ঋক্ কাল অনেক রাতে নেশা করে ফিরেছে। আজকাল সুযোগ পেলেই ড্রিঙ্ক করছে ছেলেটা! মদ তো খায়ই, অমিতের সন্দেহ ড্রাগ্স ট্রাগ্সও নেয় বোধহয়। ওর বন্ধু মন্টি'র জন্মদিনের পার্টি থেকে যেদিন প্রায় বেসামাল অবস্থায় ফিরেছিল, সেদিনও ঋকের জামায় এবং হাতায় গুঁড়ো গুঁড়ো সন্দেহজনক কিছু একটা লেগেছিল! তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ সেটা ঠিকই ধরেছিল। ধমক-ধামক দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাজ হয়নি। ঋক্ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে—'বাবা হয়েছ, বাবার মত থাকো! মা হতে যেও না। আমার প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার তোমার নেই, সে তুমি যতই দুঁদে পুলিস অফিসার হও না কেন!'

এমন উত্তর পেয়ে আর কথা বাড়াননি অমিত। মা মরা ছেলেটাকে বেশি কড়া কথা বলতে খারাপ লাগে তাঁর। ছোটবেলা থেকেই মাতৃহীন শিশুটিকে বুকে করে বড় করেছেন। কথায় আছে, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। তাই এখনও কিছু বলেননি, শুধু হাতে নাতে ধরার অপেক্ষায় আছেন।

সারা রাস্তা চুপ করেই থাকলেন অফিসার ভাদুড়ি। অন্যান্য দিন ড্রাইভার শিউশরণের সঙ্গে নানারকম গল্পগাছা করেন। নিজে সিগারেট খেলে ওকেও ভাগ দেন। আজ কিন্তু সেসব কিছুই করলেন না। বরং একটু পরেই কাচ নামিয়ে একের পর এক সিগারেট খেতে লাগলেন। ঘরে অশান্তি, বাইরে অশান্তি! লুলু! এই লুলু কিছুতেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে না!

'আপনারা এখন টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন লুলুকে। সারা শহর, পুলিস, প্রশাসন, এমনকি নিজের বাবা-মাও যে হতভাগ্য ধর্ষিতা শিশুটিকে ভুলে গিয়েছিল—লুলু তাকে ভোলেনি। সে আজও সুবিচারের দাবিতে ধরনা দিয়ে বসে আছে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অমিত ভাদুড়ির বাড়ির সামনে! এমন অদ্ভুত প্রতিবাদ, এমন অভূতপূর্ব ধরনা আর কবে দেখেছে কলকাতা? অনেক ভুখ--হরতাল, অনেক প্রতিবাদ, মোমবাতি মিছিলের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী

এই শহর শুধুমাত্র একজনের এমন জোরালো এবং নিঃশব্দ প্রতিবাদ আগে কখনও দেখেনি। সেই প্রতিবাদে প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। অথচ লুলু কোনও প্ল্যাকার্ড, কোনও ফেস্টুন বা মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদে নামেনি। তার হাতিয়ার শুধু একটি রুটি! হ্যাঁ...আপনারা ঠিকই শুনছেন—একটি রুটিই হয়তো খুশি লস্কর মার্ডার কেসের ভাগ্য ঘোরাতে চলেছে! আসুন, আমরা আরেকবার দেখে নিই সেই লুলুকে যে আজ গোটা শহরের কাছে প্রতিবাদ ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে! লুলুর সঙ্গে খুশির রক্তের সম্পর্ক ছিল না। শুধু আত্মিক সম্পর্ক ছিল! আর সেই সম্পর্কই আজ ন্যায় বিচারের দাবিতে এসে দাঁড়িয়েছে সমস্ত অন্যায়ের সামনে! একাই লড়ে যাচ্ছে খুশি লস্করের জন্য!'

থানার ভেতরে পা রাখতে না রাখতেই উচ্চগ্রামে টেলিভিশনের আওয়াজ কানে এল অমিতের। অর্থাৎ থানার ভেতরেও নিউজ চ্যানেলের ঐ একই কচকচি চলছে। রিপোর্টার তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। স্টুডিওতে বিশেষজ্ঞের দল আলোচনায় বসে গিয়েছেন। লুলুর এ জাতীয় বিস্ময়কর আচরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত! অমিত ঘরে ঢুকে দেখলেন জুনিয়র অফিসার থেকে কনস্টেবল—সবাই হাঁ করে টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। স্ক্রিনে লুলুর উদ্ভাসিত ছবি, ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজছে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'। আর নীচ দিয়ে স্ক্রল যাচ্ছে—' ধর্ষিতা শিশুটির জন্য সুবিচারের দাবিতে ধরনায় বসল লুলু'!

'মিত্র! কেবিনে এসো। কথা আছে।'

তিনি মনে মনে বিরক্ত হলেও ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে গটগট করে নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর জুনিয়র অফিসার তপন মিত্র ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটলেন। অফিসার ভাদুড়ি যে বিরক্ত হয়েছেন তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কোনওমতে দুরুদুরু বক্ষে অমিতের কেবিনে ঢুকে বললেন—'ইয়েস স্যার?'

অমিত জলের গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেয়ে তাঁর দিকে তাকালেন—'খুশি লস্কর গ্যাংরেপ ও মার্ডার কেসে কোনও লিড পাওয়া গেল? তোমাকে লোক্যাল হিস্ট্রিশিটারদের রাউন্ড আপ করতে বলেছিলাম না?'

'সবাইকে লক-আপে পুরেছি স্যার। কচুয়া ধোলাই চলছে'। তপন মিত্রের সপ্রতিভ উত্তর—'তবে কেউ মুখ খুলছে না'।

'হুম্। খুশির শরীরে একাধিক সিমেনের ট্রেস ছিল। ওদের সবার স্যাম্পল্ কালেক্ট করে ফরেনসিকে পাঠাও। দেখা যাক কী হয়'।

অফিসার মিত্র মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন। অমিতের মুখে চিন্তার ছাপ। আপনমনেই তুলে নিলেন খুশি লস্কর রেপ-মার্ডার কেসের ফাইল! প্রথম পাতাটা খুলতেই তার ছবি বেরিয়ে পড়ল।

খুশি লস্কর এক ছ'বছরের শিশুকন্যার নাম! ঘরে হয়তো পরার মত একখানাই শতচ্ছিন্ন ফ্রক ছিল তার। কারণ ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যত ছবি বেরিয়েছে, তার সবকটিতেই এই জামাটাই পরে আছে সে। তার ছিন্নভিন্ন লাশের গায়েও এই জামাটাই ছিল। এই নোংরা, ছেঁড়া ফ্রকটিতে এমন কোন যৌন ইশারা ছিল যে কিছু পুরুষকে জানোয়ারে পর্যবসিত করল! কিংবা তার এই সরল, নিষ্পাপ চোখে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকার মধ্যে কোন কুহকের আভাস পেল দুষ্কৃতীরা যে তাদের কামনা ও রিরংসা আগুনের মত পুড়িয়ে ছারখার করে দিল মেয়েটির শৈশবকে?

উত্তর জানা নেই!

৩

'এখন আর জিজ্ঞাসাবাদ করে কী হবে হুজুর!'

খুশি লস্করের রিকশওয়ালা বাপ দু হাত জোড় করে বলল—'আমরা আর এসব ঝামেলায় জড়াতে চাই না! খুশি তো একা নয়, আরও পাঁচ-পাঁচটা নেন্ডি-গেন্ডি আছে আমার। আমি নিজে দু বেলা রিকশ চালাই। বড় ছেলেটা বখে গিয়েছে। নেশা-ভাঙ করে পড়ে থাকে। মেজটা বেকার, ফ্যা ফ্যা করে ঘোরে! বাকিগুলোকে তো দেখছেনই। একটা চার বছরের, একটা দুই, আর একটা কোলের! আমি একাই সংসার চালাই। এসব কোর্ট-কাছারি, জেরা-পুলিসের চক্করে সারাদিনের কামাই নষ্ট হবে। তখন এই পাঁচটা আন্ডা-বাচ্চাকে কী খাওয়াবো?'

জবাবটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অমিত ভাদুড়ি। অফিসার মিত্রও হতবাক! লোকটার তোবড়ানো, হাড়-সর্বস্ব মুখে একফোঁটা যন্ত্রণারও লেশ নেই! যেন খুশি বলে তার জীবনে কোনওদিন কেউ ছিল না!

অফিসার ভাদুড়ির বাড়ি থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে গজিয়ে ওঠা এই বস্তির বাসিন্দা খুশি লস্করকে এরকম ঘৃণ্যভাবে খুন করা হল, অথচ তার মা-বাপ নিরুত্তাপ! এমনকি স্বয়ং অফিসার ভাদুড়ি তার লাশ দেখে কেঁপে উঠেছিলেন! মনে হয়েছিল, একটা মাংসপিন্ডকে খুবলে খুবলে খেয়েছে কিছু হিংস্র জানোয়ার! ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী—মেয়েটা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগেও আপ্রাণ লড়েছিল। তার ফলে তার শরীরের একটি হাড়গোড়ও আস্ত ছিল না! বুকের হাড়, মাথার খুলি ভেঙেছে! সারা গায়ে কালশিটে! হয়তো মেয়েটা ইন্টারনাল ব্লিডিঙের ফলেই মরে যেত। তবুও তার কচি গলার হাড় ভেঙে দিয়েছে খুনি। এমনকী মৃত্যুর পরও সেই মৃতদেহকে বারবার রেপ করে গিয়েছে। স্বয়ং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন—'এ শুধু রেপ কেস নয় অফিসার! এ নৃশংসতা ও বিকৃতির চূড়ান্ত!'

সেই লাশ নিশ্চয়ই খুশির বাপ-মাও দেখেছে। অথচ তাদের বক্তব্য—'আমরা ঝামেলায় জড়াতে চাই না হুজুর!'

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—'সেদিন অতরাতে খুশি বেরিয়েছিল কেন?'

এবার ওর মা জবাব দিল, 'ঘরে আটা ছিল না। আমার শরীলটাও ভালো ছিল না। খুশির বাপ, দাদারা তখনও ঘরে আসেনি। এই কাছেই মুদির দোকান! ওকে আটা আনতে পাঠিয়েছিলাম। আর ফেরেনি!'

'আপনারা খোঁজেননি ওকে?'

'খুঁজেছি। সমস্ত বস্তির লোকেরা গোটা রাত তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কোথাও পায়নি। শেষে ভোরবেলায় ঐ দূরের ফাঁকা মাঠটায় ওকে পাওয়া গেল! আপনি তো দেখেছেনই...!'

'কাউকে সন্দেহ হয় আপনাদের? বস্তির কেউ বা এমন কোনও আগন্তুক যে খুশিকে বিরক্ত করত?'

এবার দুজনেই হাতজোড় করে ফেলেছে! খুশির বাবা বলল—'আমরা কিছু জানি না স্যার! কিচ্ছু বলতে পারব না। এমনিতেই ঘরের মেয়ের যখন ইজ্জত নষ্ট হয়, তখন সবচেয়ে বেশি দুর্নাম তার পরিবারেরই হয়! খুশি মরে বেঁচেছে! আপনারা আমাদেরও বাঁচতে দিন!'

এরপর আর কোনও কথাই বলা চলে না।

বস্তির এককামরার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে দুজন অফিসারই দেখলেন, স্থানীয় এম এল এ-র গাড়ি ঠিক বস্তির মুখটাতেই এসে থামল। পেটমোটা নেতা ধুতি-পাঞ্জাবি সামলে, একটা বিটকেল সবুজ রঙের সানগ্লাস চোখে দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। অমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন—'আরে স্যার, এখানে কি তদন্ত করতে?'

অমিতের মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। এই লোকটা অতি ধান্দাবাজ। এখানেও নিশ্চয়ই কোনও ধান্দাতেই এসেছে। পুলিস যেসব লোক্যাল হিস্ট্রিশিটারদের তুলে নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি দিচ্ছে, তার মধ্যে কয়েকজন ওঁরই লোক! নির্বাচনী প্রচারে নেতার হয়ে গলা ফাটায়। সম্ভবত সেই কারণেই খুশির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে

এসেছেন। তিনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন—'আপনি এখানে যে?'

'হেঁ হেঁ!' পান ও গুটখা খাওয়া দাঁত বের করে রাজনীতিবিদ হাসলেন, 'আমার এলাকায় এমন একটা অনর্থ হয়ে গেল, আর আমি আসব না? একটা দুঃস্থ ঘরের মেয়ের সঙ্গে এমন অত্যাচার! তার পরিবারের কথা কেউ ভাবছে না! ভুখা, দরিদ্র মানুষের পাশে আপদে বিপদে দাঁড়ানোই তো আমার কর্তব্য। তাই ছুটে এলাম।'

'হুঁ'! নেতা যখন 'ভুখা, দরিদ্র মানুষ' শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন ঠিক তখনই অমিত একঝলকে তাঁর জাবুলানি ফুটবলের সাইজের ভুঁড়িটা দেখে নিলেন। তাঁর হাতের একটা মোটা প্যাকেটও নজর এড়াল না!

'তা মেয়েটির বাবা-মা কিছু বলতে পারল? কে করেছে এসব?' নেতা কৌতূহলী। অমিত মৃদু হাসলেন—'নাঃ। ওরা কেউ কিছু বলতে পারছে না'।

'অ!' তিনি একটু গলা নামিয়ে বললেন—'তবে বলি কী, আপনি যে পটল, বাবলুদের আটকে রেখেছেন সেটা একেবারেই অনর্থক! ওরা নেহাতই নিরীহ ছেলেমানুষ! ওরা এসব করেনি।'

'তাই?' অফিসারের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি—'আপনি কি জানেন যে এই ছেলেমানুষরা কয়েকবছর আগেও বক্সিং ও রেপকেসে শ্রীঘরে গিয়েছিল? সেটাও কি নেহাতই ছেলেমানুষী?'

বাউন্সারটা খেয়ে নেতা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু কড়া গলায় বললেন—'ঘটনার দিন সারারাত ওরা পার্টি অফিসে ছিল। ওরা ইনোসেন্ট'।

'বেশ তো। ছেড়ে দেব'। তিনি হাসলেন—'এই স্টেটমেন্টটা আপনি রিটনে দিন'।

'মানে?'

'মানে লিখিত বয়ান দিন যে ওরা ইনোসেন্ট এবং তার গ্যারান্টি আপনি দিচ্ছেন'। অমিত ভাদুড়ি সিগারেটের প্যাকেট বের করে সসম্ভ্রমে তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—'আপাতত ছেড়ে দেব ওদের। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে ওরা অপরাধী তবে জবাবদিহি কিন্তু আপনাকে করতে হবে স্যার। পুলিশকে বিভ্রান্ত করাটাও কিন্তু আইনত অপরাধ। তাই না মিত্র?'

অফিসার মিত্র কিছু বলার আগেই ক্ষান্ত দিলেন রাজনীতিবিদ। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না কারণ ইতিমধ্যেই মিডিয়ার লোক কী করে যেন খবর পেয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে। দূর থেকে তাদের ধেয়ে আসতে দেখে মুচকি হাসলেন। অমিতকে নমস্কার জানিয়ে বিনীতভাবে বললেন—'আচ্ছা, আসি। জয় হিন্দ!' পরক্ষণেই নীচু স্বরে যোগ করলেন—'বেস্ট অব লাক। তবে কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না'।

অমিত ভাদুড়ি তাঁর হাতের মোটা প্যাকেটটার দিকে তাকালেন —'সে তো বুঝতেই পারছি'।

নেতা আর কথা বাড়ালেন না। এগিয়ে গেলেন খুশি লস্করের বাড়ির দিকে। তাঁর পেছন পেছন দৌড়ল রিপোর্টাররা। দুই অফিসার এবার ফেরার পথ ধরেন। অমিত আস্তে আস্তে বললেন—'কী

বুঝলে মিত্র?'

অফিসার মিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'বুঝলাম যে একটির শোক ভোলানোর জন্য আরও পাঁচ-পাঁচটি স্যাম্প্‌ল বিদ্যমান। খুশির বাপ-মা মরে যাবে, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলবে না। ওই মোটকা প্যাকেটটা মিষ্টির ছিল বলে তো মনে হয় না! একটা ছ'বছরের শিশুর দর তার বাপ-মা ভালোই হেঁকেছে! অন্তত প্যাকেটের সাইজ তাই বলছে!'

'আমি আরও কিছু বুঝেছি!' অমিত অন্যমনস্ক—'মিত্র, সবাই যা চেয়েছিল, সব পেয়েছে। খুশির পরিবার টাকা পাবে। খুশির বড়দাদা চাকরিও পাবে বলে আমার ধারণা। নেতামশাই মিডিয়া হাইপ পাবেন। আজই চ্যানেলে চ্যানেলে তাঁকে খুশির বাপকে জড়িয়ে ধরার ছবি দেখা যাবে। অনেক প্রতিশ্রুতিও দেবেন। আগামী নির্বাচনী প্রচারের অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল—লুলু কী পেতে চায়? কীসের জন্য সে এখনও নাছোড়বান্দার মত লেগে আছে?'

তপন মিত্র চুপ করে থাকেন। কম তো দেখলেন না! খুশি লস্কর-রের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা শহর প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। সমস্ত সেলিব্রিটিরা ক্যামেরার সামনে চোখের জল ফেলেছিলেন। গোটা শহরে তো হাফ ডজন মোমবাতি মিছিলই হয়ে গেল! অভিনেতা--অভিনেত্রীরা চোখে সানগ্লাস আর ফ্যাশনেব্‌ল পোশাকে প্রকাশ্যে হাঁটলেন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রতিবাদে গর্জে উঠল জনতা। পুলিশের মুণ্ডুপাত করল! কয়েক হাজার লোক পোস্ট দিল—'খুশি লস্কর আমার মেয়ে'।

কিন্তু তারপর? ঠিক সাতদিনের মাথায় দুই সেলিব্রিটি বিয়ে করলেন! সেলিব্রিটি দম্পতির বিয়ের মেনু, ভেন্যু, হীরের গয়না, সোনার এম্ব্রয়ডারির চোখ ধাঁধানো আলোয় ম্লান হয়ে গেল ছেঁড়া ফ্রক পরা এক শিশুর ছবি! কেউ তাকে মনে রাখেনি! তার ফাইলটাও আনসলভ্‌ড কেসের ফাইলের স্তূপে চাপা পড়ে যেত, যদি না এই হতভাগা লুলু নিজের অজান্তেই হাঙ্গামা করত!

দুই অফিসার এরপর যে মুদির দোকানে খুশি আটা আনতে গিয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বেচারি মুদির সারা গায়ে, জামায় আটার ছোপ। ঝেড়ে ঝেড়েও সাফ করতে পারছে না। দোকানে খদ্দেরের ভিড়। তবু সে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল। হ্যাঁ, খুশি সে রাতে এসেছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে সে বস্তির দিকেই চলে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছে, তা বলতে পারবে না। একটা চলন্ত গাড়ির পেছনে লুলুকে পাগলের মত দৌড়তে দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু তখন তার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। তাই গাড়িটাকে সে তেমন ভালোভাবে নজর করেনি। নম্বর বা অন্য কোনও তথ্য দিতে পারবে না। তবে খুশিকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। তার সঙ্গে লুলুর সম্পর্কও সর্বজনবিদিত। লুলু খুশির একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুখ-দুঃখের সাথী। শৈশব থেকেই সে একটু অদ্ভুত। অন্য সবার মত নয়, একদম অন্যরকম। আজ পর্যন্ত মারামারি করতে তাকে কেউ দেখেনি। খুশি এই অনাথটাকে রোজ নিজের ভাগের দুটো রুটি থেকে একটা রুটি দিত। বড় দরাজ মনের মেয়ে ছিল। তার এই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে সে দুঃখপ্রকাশও করল।

শেষ কথাটা শুনে অফিসার ভাদুড়ি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন—'এখন তো খুশি নেই! লুলুকে তবে কে রুটি দেয়?'

মুদি একটু ম্লান হাসে—'বস্তির লোকেরাই পালা করে দেয় স্যার। রোজ ভোর ভোর লুলু এসে প্রত্যেকটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা মারে। কেউ বিরক্ত হয়। আবার যার ঘরে বাড়তি রুটি থাকে সে হয়তো দিয়ে দেয়। বেশ কয়েকবার তো আমিও দিয়েছি। ও পাগলটাকে আর কে দেখবে? ওর জন্য মায়া হয়। তখন তো জানতাম না যে হতচ্ছাড়া আপনাকে এমন করে জ্বালাচ্ছে!'

অবশেষে ডিউটি সেরে ক্লান্ত দেহে অমিত যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন রাত প্রায় এগারোটা! বস্তি থেকে একবার অকুস্থলটাও ঘুরে এসেছেন। মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিল যে যদি কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় যা হয়তো গতবার নজরের বাইরে থেকে গিয়েছে! কিন্তু সেসব কিছুই নেই! কোনও প্রমাণ নেই! খুশি লস্করের দেহে যে 'সিমেন' এর ট্রেস পাওয়া গিয়েছিল, তা লক-আপে বন্দী সবার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আজই এসেছে রিপোর্ট। রেজাল্ট-নেগেটিভ!

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই বাড়ির লনের দিকে তাকালেন তিনি! যথারীতি সেখানে বসে আছে লুলু! স্থির একটা মূর্তি যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর বাড়ির লনে! অমিত জীবনে এই প্রথম ভীষণ অসহায়বোধ করলেন। কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। একটি প্রমাণও হাতে নেই, খুশির মা-বাবা মুখ খুলতে চায় না, বস্তির রাস্তায় কোনও সিসিটিভি নেই যে ফুটেজ পাবেন, সিমেনের রিপোর্টও নেগেটিভ! কী করে কেস সলভ করবেন! শুধু একটা লিড যদি পেতেন! স্রেফ একটা ইঙ্গিত...ওঃ ঈশ্বর!

পরাজিত সৈনিকের মত মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে অমিত ভাদুড়ি এগিয়ে গেলেন বাড়ির দিকে। দোরগোড়ায় আজও পড়ে আছে সেই রুটি...!

সেটাকে এড়িয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন অমিত! চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে দেখলেন সেই সস্তা আটার রুটিটাকে। তারপরই কী যেন মনে পড়ে গেল তাঁর। পরক্ষণেই দরজা খুলে ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতরে! এখন তাঁকেই ভীষণ উন্মত্ত মনে হচ্ছে! যেন কাণ্ড-কাণ্ড জ্ঞান নেই!...

কয়েকমিনিট পরেই একটা তীব্র চিৎকারের শব্দ ভেসে এল! তারপরই সব চুপ।

৪

'মেয়েটার বুকের প্রায় সবক'টা হাড়ই ভেঙে গিয়েছিল! ইন্টারন্যাল ব্লিডিং হলেও বাইরে তেমন রক্তপাত হয়নি! মেয়েটাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল'।

অমিত ভাদুড়ি ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। গ্লাসের ভেতরের সোনালি তরল সামান্য চলকে পড়ল টেবিলে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই তাঁর। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'গলা টিপে মারার সুবিধা কী বলো তো মিত্র?'

অফিসার মিত্র বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অমিতের দিকে। আস্তে আস্তে বললেন—'রক্তের দাগ থাকে না'।

'ইয়েস, নো ব্লাডট্রেস! তাই কোনও প্রমাণ নেই! খুনির পোশাকে রক্তের দাগ থাকার বালাই নেই! অথচ ঐ ছ'বছরের শিশুটার নীল কালশিটে পড়া শরীর, ফুলে ওঠা চোখ মুখ, দলামোচা পাকানো শরীরটাকেও তো অগ্রাহ্য করা যায় না'। তিনি একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন—'ওর অপরাধীদের কাছে পৌঁছনোর অনেক চেষ্টা করেছি আমরা! কিন্তু সবদিকেই ডেড-এন্ড! সরকার বলছে 'কেস ক্লোজ করুন', নেতা ও সেলিব্রিটিরা বলছে—'অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হোক', জনতা বলছে—'শাস্তি চাই!' আমরা বলছি—'তদন্ত হচ্ছে, ধৈর্য ধরুন'। কিন্তু লুলু কী বলছে, তা কেউ বুঝল না!'

অফিসার মিত্র'র মনে কৌতূহল আরও ঘনীভূত হয়। এই কথাগুলো বলার জন্যই কি স্যার এই ভোররাতে তাঁকে ফোন করে, হুড়ো দিয়ে ডেকে আনলেন! বারবার বললেন—'প্লিজ, ইউনিফর্মে এসো মিত্র। কথা আছে'। সিনিয়র অফিসারের আদেশ অমান্য করা অসম্ভব। তাই আরামের শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে এসে হাজির হয়েছেন তাঁর বাড়িতে। অথচ ঘরে ঢুকতেই দেখলেন, মদের বোতল আর ল্যাপটপ টেবিলে রেখে বসে আছেন অফিসার ভাদুড়ি! তিনি ভেবেছিলেন কোনও সিরিয়াস আলোচনা করতে চান তাঁর সিনিয়র। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই লুলু! এটা কি একধরনের মজা? না মাতলামি!

'সরি মিত্র...!' নেশাজড়িত কণ্ঠস্বরে বললেন অমিত—'তোমাকে ড্রিঙ্ক অফার করতে পারছি না। কারণ তুমি অন ডিউটি। স্মোক করতে চাইলে অবশ্য করতে পারো...!'

'না স্যার। আমি ঠিক আছি'। তপন মিত্র সবিনয়ে বললেন—'আপনি ফোনে বলেছিলেন যে কিছু আলোচনা আছে...!'

'ইয়েস...ইয়েস'। তিনি নড়েচড়ে বসেন—'আলোচনা নয়, কিছু প্রশ্ন। আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও'।

প্রশ্ন! অফিসার মিত্র আকাশ থেকে পড়লেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন প্রায় ভোর চারটে বাজতে যায়! এমন সময় স্যারের মনে কী এমন প্রশ্ন জাগল যে জুনিয়র অফিসারের রাতের ঘুম উড়িয়ে ছাড়লেন! প্রশ্নগুলো কি কাল সকালে করা যেত না? তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন অমিতের দিকে।

'প্রথম প্রশ্ন'। তিনি বললেন—'লুলু কেন আমারই বাড়ির লনে এসে বসে থাকে? এখানে আশেপাশে অনেক বাড়ি আছে। সেখানে না গিয়ে বেছে বেছে আমার বাড়িতেই কেন? হোয়াই মি?'

তপন একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—'হয়তো রাস্তাঘাটে আপনাকে দেখেছে। খুশি লস্করের বাড়ি তো আপনার বাড়ি থেকে একদম কাছে। আপনিও জগিং করতে ওদিকেই যান। একই এলাকার মানুষ। তাই ও আপনাকে পুলিস অফিসার হিসাবে আইডেন্টিফাই করেছে'।

'তার থেকেই ও বুঝেছে যে খুশি লস্করের কেসটার তদন্তকারী অফিসার আমিই! সেজন্যই আমার বাড়ির সামনে ধরনা দিচ্ছে! তাই বলতে চাইছ?' অমিতের চোখে কৌতুক।

তপন একটু বিব্রত বোধ করলেন—'কী জানি স্যার! হতেও পারে!'

'দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন অ্যান্ড আর্থ হোরেশিও...!' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। তারপর আচমকাই গম্ভীর হয়ে বললেন—'বেশ। ধরেই নিলাম যে ও ন্যায়বিচারের দাবিতে ধরনায় বসেছে। তবে রোজ একখানা রুটি রেখে যায় কেন?'

আবার খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন অফিসার মিত্র। রুটি রাখার যে অর্থটা দাঁড়ায়, সেটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন। কোনমতে বললেন—'উপহার?'

'ইউ মিন ঘুষ?' আবার হেসে উঠলেন তিনি—'তাই তো? আচ্ছা, লাস্ট প্রশ্ন'।

তপন দেখলেন অমিত ভাদুড়ির চোখ দুটো যেন দপদপিয়ে জ্বলছে। দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুট রাগে বললেন—'যে শুয়োরের বাচ্চারা একটা ছ'বছরের শিশুকে বারবার রেপ করে, বাধা দিলে অসহায় শিশুটিকে এমন পেটায় যে তার শরীরের সবক'টা হাড় ভেঙে যায়, তারপর তার গলার হাড় ভেঙে দিয়ে মেরে ফেলে এবং মৃত্যুর পরও একাধিকবার তাকে রেপ করে—সেই জানোয়ারগুলোর ঠিক কী শাস্তি হওয়া উচিত বলো তো?'

'আজীবন কারাদন্ড বা ফাঁসি'।

'উঁহু...উঁহু...!' তিনি মাথা নাড়ছেন—'আইনের রক্ষক হিসাবে নয়, একজন মানুষ হিসাবে বলো। কী করা উচিত ওদের সঙ্গে?'

অফিসার মিত্র'র মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে উঠল ছ'বছরের শিশুটার দলামোচা পাকানো দেহটা! তিনি রুক্ষস্বরে বললেন—'ওরা মেয়েটার সঙ্গে যা যা করেছে, ঠিক তাই করা উচিত! উলটো করে ঝুলিয়ে এমন পেটানো উচিত যাতে শরীরের একটা হাড়ও আস্ত না থাকে। পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়া উচিত শালাদের! যে যন্ত্রণা ছ বছরের শিশুটা সহ্য করেছিল, তার থেকেও অনেক বেশি যন্ত্রণা দিয়ে মারা উচিত ওদের'।

'রিয়েলি?'

'ইয়েস স্যার'।

নির্দ্বিধায় উত্তর দেন অফিসার মিত্র। তাঁর উত্তরটা শুনে ফের মৃদু হাসেন অমিত। আস্তে আস্তে বলেন—'একবার পাশের ঘরটা দেখে আসবে প্লিজ?'

এরকম অদ্ভুত অনুরোধের কারণ ঠিক বুঝতে পারেন না তপন। কিন্তু তবুও একটা চাপা কৌতূহল নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। কিন্তু যা দেখলেন, তাতে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যায়! মনে হল, পায়ের তলার মাটি কাঁপছে! যা দেখছেন তা কি বাস্তব? না কোনও দুঃস্বপ্ন!

ঘরের সিলিঙে দড়ি দিয়ে উলটো করে ঝোলানো রয়েছে দুটি দেহ! তাদের দেখলেই বোঝা যায় কী প্রচন্ড অত্যাচার করা হয়েছে দুজনের ওপরে! কেটে দেওয়া হয়েছে পুরুষাঙ্গ! মুখ, হাত বাঁধা! কপাল বেয়ে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। চোয়াল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই! তাদের যন্ত্রণাবিকৃত মুখই বলে দেয় যে কী বীভৎস মৃত্যু পেয়েছে তারা!

অফিসার মিত্র আর সহ্য করতে পারলেন না! ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অমিত ভাদুড়ি তখনও খুব নিস্পৃহভাবে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন—'দেখলে?'

'স্যার...!' কোনমতে উচ্চারণ করলেন তপন—'ও তো ঋক আর মন্টি! আপনার ছেলে আর তার বন্ধু...!'

'ও কারওর ছেলে নয়! শয়তান কারওর আত্মীয় হয় না মিত্র!' গর্জন করে ওঠেন অমিত—'হি ইজ্ আ ব্লাডি রেপিস্ট অ্যান্ড মার্ডারার! তুমি বলছিলে না, লুলু আমায় আইডেন্টিফাই করেছিল? পার্শিয়ালি কারেক্ট। তবে ও আমায় নয়, খুনিকে আইডেন্টিফাই করেছিল! সে ঐ দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজনকে চিনে ফেলেছিল! অ্যান্ড হি আইডেন্টিফায়েড দ্যাট ব্লাডি বাস্টার্ড! ও জেনে গিয়েছিল, রাক্ষসটা এই বাড়িতেই থাকে। তার জন্যই সে আমার বাড়ির সামনে এসে বসে থাকত। ঐ রুটিটা ছিল সঙ্কেত! যে শয়তানটা ক্ষুধার্ত খুশিকে সেদিন রাতের রুটিটা খেতে দেয়নি, তাকে উদ্দেশ্য করে ও রোজ বলত—'তোরা যখন মেয়েটাকেই ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছিস, তখন ওর ভাগের রুটিটাও খা হারামজাদা!' আমরা কেউ বুঝতে পারিনি ওকে। ও যদি ঋকের ওপর আক্রমণ করত, তাহলেও বোঝা যেত। কিন্তু মুদি বলেছিল না, লুলু একদম অন্যরকম...!'

বলতে বলতেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি—'ঐ রুটিটা বিরাট ক্লু ছিল মিত্র! লুলু অজান্তেই আমাদের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিল। লালচে মোটা দানার আটার রুটি! আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম যে মেয়েটা সেদিন আটা কিনতে গিয়েছিল। কিনেওছিল! যখন দুষ্কৃতীরা ওকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়, তখন আটার ঠোঙাটা ধস্তাধস্তিতে ফেটে যায়। আটা ছড়িয়ে পড়ে। তোমার মনে আছে, সেই মুদির জামায়, সর্বাঙ্গে আটার দাগ লেগেছিল? এই আটা প্যাকেটের শৌখিন, মিহি আটা নয়। মোটা দানা বলে একবার গায়ে লাগলে ঝেড়ে ফেলা মুশকিল! খুনীদের জামাতেও সেদিন আটা লেগেছিল। জুতোর নীচেও ছিল আটার দাগ। সেদিন মন্টির জন্মদিনের পার্টি থেকে ঋক্ যখন ফিরেছিল তখন ওর জামায়, হাতায় লালচে গুঁড়ো দেখতে পেয়েছিলাম। তখন বুঝিনি। ড্রাগের গুঁড়ো বলে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আজ বুঝেছি! এই দেখ...!'

তিনি ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিলেন। সেখানে মন্টি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তার জন্মদিনের ছবি পোস্ট করেছে। অফিসার মিত্র স্পষ্ট দেখলেন মন্টি ও ঋক দু'জনের জামাতেই কিছুর একটা হাল্কা ছাপ! আটার গুঁড়ো!

'ঋকের জুতোতে আটার গুঁড়ো এখনও লেগে আছে। আজ আমি দেখেছি! ওকে কয়েক ঘা মারতেই সব বলে দিল! পার্টির দিন মদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও আর মন্টি মদ কিনতে বেরিয়েছিল। মদের দোকানটা বস্তির কাছেই পড়ে। ওরা শুনশান রাস্তাতে মেয়েটিকে

দেখতে পায়, এবং...!'

বলতে বলতেই চেঁচিয়ে উঠলেন অমিত—'ভাবতে পারছ মিত্র! কতবড় পাষন্ড এরা! একটা শিশুকে রেপ করে, মার্ডার করে ফের পার্টিতে গিয়ে ফূর্তি করেছে! কোনও অনুতাপ নেই! নো ফিলিংস্! ওদের বেঁচে থাকা উচিৎ?'

অফিসার মিত্র কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর দিকে এবার দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অফিসার অমিত ভাদুড়ি—'নাউ, অফিসার মিত্র—তুমি এখন অন ডিউটি। তোমার কর্তব্য কর। অ্যারেস্ট মি'।

অফিসার মিত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বসে থাকেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ দরজার কাছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ! উপস্থিত দুজনেই সবিস্ময়ে দেখলেন—লুলু এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তারপর কোনও শব্দ না করে এই প্রথমবার রেখে দেওয়া রুটিটা নিজেই ফেরত নিল। তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে...!

একটা বিরাট শূন্য মাঠ! এই মাঠের বুকেই একদিন ছোট্ট মেয়েটাকে চূড়ান্ত যন্ত্রণা দিয়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল কতগুলো নরপশু! কেউ মনে রাখেনি সে কথা! শুধু একজন আজও তার কথা ভোলেনি। সেই মেয়েটা এখনও এখানে ঘুরে বেড়ায়! যন্ত্রণায় কাঁদে। কেউ তাকে দেখতে পায় না, সেই একজন ছাড়া!

লুলু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সেদিকে। সযত্নে রুটিটাকে রাখল মাটির ওপরে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল যে এক যন্ত্রণাকাতর, ক্ষুধার্ত শিশু ক্রমাগত এগিয়ে আসছে তার দিকে। অনেকদিন ধরে ক্ষুধার্ত ছিল মেয়েটা। আজ খেতে পাবে।

সে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠে—'খেয়ে নে মা! আজ নিজের ভাগের রুটিটা খেয়ে নে! তোর মাও এখন তোর নামের রুটিটা বানাতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু দ্যাখ, তোর লুলু ভোলেনি! আমাকে ভয় কী মা? আমি তো মানুষ নই! ...'

লুলু সেই ব্যথিত শিশুর সঙ্গে কথা বলতেই থাকে। নিস্তব্ধ মাঠের নৈঃশব্দকে চিরে শোনা যায় তার সংলাপ—

'ভৌ...ভৌ...ভৌ!'

কোলাজ : তপন সাহা

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book